সৈয়দ আসাদুজ্জামান

শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা : একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা

বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সব সময়ই একটা অদ্ভুত 'হুজুগ' লক্ষ্য করা যায়। আর হবেই না বা কেন? বাঙালি তো আসলেই 'হুজুগে জাতি'। তাদেরকে তো বলাই হয় 'হুজুগে বাঙালি'। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ 'হুজুগ'টা খুব স্পষ্টই ফুটে ওঠে। পাকিস্তান আমলের শেষ পর্যায়ে দেখা যেত 'ইনডেনটিং' ব্যবসায়ের 'হুজুগ'। তখন ঢাকা শহরসহ সারা বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাঙের ছাতার মতই গজিয়ে উঠতে দেখা গেছে 'ইনডেনটিং' ব্যবসায়। আমার পরিচিত অনেককেই একটি সাইনবোর্ড ও একটি লেটার হেড এবং সেই সঙ্গে কেউ কেউ বা টাইপ রাইটার নিয়ে তখন 'ইনডেনটিং' ব্যবসায় শুরু করে দিয়েছিল। ব্যবসায়ের সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞেস করলে কেউ কেউ আশাবাদী ভাব দেখিয়ে বলত, 'এই দেখ না এখন লবণের দাম চড়া। লবণের ইনডেনটিংটা লেগে গেলেই কয়েক লাখ টাকা!' আবার কেউ বা বলত, কলম্বো থেকে নারকেল তেল আমদানির ইনডেনটিংটা 'ক্লিক' করলে আর পায় কে! এভাবে তখন কেবল ঢাকা-চট্টগ্রাম নয়, দেশের সব শহর-নগর-বন্দরে এ ধরনের 'ইনডেনটিং' ব্যবসায়ী গজিয়ে উঠেছিল। কিন্তু হলে কি হবে? শেষ পর্যন্ত যা হওয়ার তাই হয়েছে। এক সময় ব্যবসায়টা এমন মুখ থুবড়ে পড়েছিল যে কয়েকটি বড় 'ইনডেনটিং হাউস' ছাড়া আর কোনটিরই চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি!

হালে শুরু হয়েছে 'রিয়াল এস্টেটের' ব্যবসায়। ঢাকার মাঝখানেই নয় আশপাশেও এক খণ্ড জমি পেলেই হয়। ডেভেলপারকে দিয়ে দিলে তারা পছন্দ মতো বাড়ি তুলে জমির মালিককে চুক্তি মোতাবেক কিছু ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট দিয়ে বাকিটা নিজেরা ভোগ করবে। এর সুবিধা হচ্ছে এই যে, জমির মালিককে নিজের সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাড়ি তুলতে হয় না। অপরদিকে ডেভেলপাররাও ফাঁকতালে জমি পেয়ে যায় বিনামূল্যে। তাদেরকে অবশ্যি অ্যাপার্টমেন্ট বানাবার জন্য নিজেদের টাকা খাটাতে হয়। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের লাভই হয়।

আমার পরিচিত অনেকে এবং আত্মীয়দের মধ্যে অবস্থাপন্ন সবাই এখন এই 'রিয়াল এস্টেট' ব্যবসায়ে নেমে গেছে। এমনকি যারা কদিন আগেও পুস্তক প্রকাশনা ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল, আমার তেমন কিছু আত্মীয়ও এখন এই 'রিয়াল এস্টেটের' গোলক ধাঁধায় ঘুরছে।

এ অবস্থার ফলশ্রুতিতে ঢাকা শহরে এখন আর আকাশছোঁয়া অট্টালিকার ভিড়ে আকাশ দেখার উপায় নেই। সেদিন আমি একজনকে বলছিলাম যে, এখন যদি কেউ বিদেশে যায়, তাহলে দশ বছর পর ফিরে এসে সে হয়তো সারা শহরের কোথাও কোন একতলা-দোতলা বাড়ি কিংবা খালি জায়গা দেখতে পাবে না। আমি জানি অনেকেই বলবে যে, আমাদের 'প্রকট বাসস্থান সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য এ ধরনের 'রিয়াল এস্টেট' ব্যবসায় সম্প্রসারণ প্রয়োজন। কিন্তু একটু গভীরে তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, যে হারে 'লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট' তৈরি হচ্ছে এবং যে হারে পুরাতন একতলা-দোতলা ভবন ভেঙে পনের-বিশ এমনকি পঁচিশ-ত্রিশতলা ভবন তৈরি হচ্ছে, সে অনুপাতে অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্লাট কিংবা অফিস কক্ষের ক্রেতা বা ভাড়াটে নেই। সুতরাং এটা ভাবা অবাস্তব হবে না যে, শিগগিরই 'রিয়াল এস্টেট' ব্যবসায়ও মুখ থুবড়ে পড়বে এবং 'হুজুগে বাঙালিদের জন্য আর একটি 'হুজুগে ব্যবসায়ের' করুণ পরিণতি ঘনিয়ে আসবে। আমি বলছি না যে বাসস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্লাটের দরকার নেই। নিশ্চয়ই দরকার আছে। তবে তা হচ্ছে স্বল্প আয়ের নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য কম মূল্যের অ্যাপার্টমেন্ট কিংবা ফ্লাট। এগুলোর জন্য যত উঁচু ভবনই বানানো হোক না কেন, ক্রেতা বা ভাড়াটে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। তখন একদিকে যেমন নাগরিকদের বাসস্থান সমস্যার সমাধান হবে, অন্যদিকে তেমনি অব্যবহৃত খালি জায়গা ও জীর্ণদশার ভবনগুলোরও সুরাহা হবে।

সে যা হোক, যে কথা বলার জন্য এসব প্রবণতার কথা বলা হল তা হচ্ছে এই যে, ঢাকার সর্বশেষ 'হুজুগ' হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবসায় গড়ে তোলা। ঢাকায় এখন এমন একটিও এলাকা নেই, যেখানে বহুসংখ্যক শিশুশিক্ষা নিকেতন বা কিন্ডার গার্টেন বা শিশুদের টিউটোরিয়াল স্কুল গড়ে ওঠেনি। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এসব স্কুল সব সময়ই ছাত্রছাত্রীতে ভরপুর থাকে। অথচ এদের টিউশন ফি অনেক বেশি। উদাহরণ স্বরূপ 'প্লে গ্রুপে'র মাসিক বেতন চারশ' থেকে এক হাজার টাকা। এভাবে যতই উর্ধ্বে ওঠা যাবে, ততই নামকরা স্কুলগুলোর টিউশন ফিও উর্ধ্বমুখী হবে। তবু এসব স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের কোন ঘাটতি নেই।

একই তালে তাল মিলিয়ে শহরের সর্বত্র গড়ে উঠেছে অসংখ্য 'কোচিং সেন্টার'। ক্লাস ফোর-ফাইভ থেকে শুরু করে 'ও লেবেল', 'এ লেবেল' কিংবা ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি ক্লাস পর্যন্ত সব ক্লাসের ছেলেমেয়েদেরই এসব 'কোচিং সেন্টারে' শিক্ষা দেয়া হয়। 'কোচিং সেন্টার'-এর পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বাসভবনের প্রাইভেট টিউশনি বা নিজস্ব কোচিংয়ের ব্যবস্থা। আমি রামপুরার একজন স্কুল শিক্ষকের কথা শুনেছি যার মাসিক আয় এক লাখ টাকা। সে ভোর ছয়টা থেকে শুরু করে রাত বারোটা পর্যন্ত প্রাইভেট টিউশনি করে এবং এরই ফাঁকে সে স্কুলেও শিক্ষকতা করে। বলা বাহুল্য, যে ডাক্তাররা হাসপাতাল অথবা মেডিক্যাল কলেজে রোগী দেখার পাশাপাশি নিজেদের বাড়িতে কিংবা 'চেম্বারে' রোগী দেখে তাদের হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে রোগী দেখার চেয়ে মনোযোগ বেশি থাকে নিজস্ব 'চেম্বার' কিংবা বাড়িতে রোগী দেখার ওপর। শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এমনও অভিযোগ শোনা যায়, কোন বিশেষ ছাত্রছাত্রী কোন স্কুলের বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর 'কোচিং' বা প্রাইভেট টিউশনির অন্তর্ভুক্ত না হলে তাকে সেই শিক্ষক ইচ্ছে করে পরীক্ষায় কম নম্বর দেবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবসায়ের সুযোগে এখন আবার গড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রাইভেট ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এই সেদিন একটি পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে পড়ছিলাম যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার নামে যা হয়, তাকে কোন মতেই বিশ্ববিদ্যালয় মানের পড়াশুনা বলা চলে না। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত ক্যাম্পাস, পরিবেশ ও সিলেবাস কোনটাই এসব তথাকথিত 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে' নেই। সম্প্রতি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দান খুব উদারভিত্তিক ও ঢালাওভাবে হওয়ার কারণে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়।

উদাহরণ স্বরূপ নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির কথাই ধরা যাক। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে উচ্চবিত্তের অভিভাবকদের ছেলেমেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এর কারণ, প্রথমত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেশনজট', জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তখন ছাত্রদের ওপর হামলা, শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন, এমনকি সম্প্রতি ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা। এই নিবন্ধের গোড়াতে 'হুজুগে বাঙালিদের' যে 'ব্যবসায়ী হুজুগের' কথা বলেছিলাম, তারই সূত্র ধরে আবারও বলতে হচ্ছে যে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও বাঙালিদের সে একই 'হুজুগে ব্যবসায়ী মনোভাব' কাজ করছে। আর করবেই বা না কেন? যে কোনভাবে একটি যেনতেন প্রকারের বাড়ি জোগাড় করে যে কোন একটি নাম নিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড তুলে দিলেই হল! ছাত্রছাত্রীদের কমতি হওয়ার কোনই কারণ নেই। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কিছুসংখ্যকের বিদেশী শিক্ষক এবং বিদেশী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'সহযোগিতা'র সুবাদে এগুলোর ভর্তি ফি এবং টিউশন ফি অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভর্তি ফি যেমন অনেক বেশি, তেমনি তাদের টিউশন ফিও আকাশচুম্বী। তবুও এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ছাত্রছাত্রীদের কোন কমতি নেই। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারাটা এখন বড় লোকের ছেলেমেয়েদের কাছে 'প্রেস্টিজের' ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানেই শেষ নয়। শোনা যায় যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে কয়েক লাখ টাকা 'চাঁদা' বা 'ডোনেশন' দিতেও অনেকে কার্পণ্য করে না।

আগেই বলেছি যে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন 'রিয়াল এস্টেট' ব্যবসায়ের মতো অনেকে লাভজনক ব্যবসায় বলে মনে করে। সুতরাং সবাই এখন এ ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকেছে। সেদিন ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় এ ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গিয়ে আমার চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। একটি সাদামাটা দোতলা বাসভবনের ওপর সাইনবোর্ড টাঙিয়ে এটাকে বলা হচ্ছে চট্টগ্রামের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা। ছাত্রছাত্রীদের নেই কোন বসার জায়গা, নেই কোন উচ্চমানের লাইব্রেরি। একই রুমে একটি ক্লাস শেষ হলে আবার পর্যায়ক্রমে আরেকটি ক্লাস শুরু হয়। তবুও এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়!

এভাবেই চলছে আমাদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বা 'উন্মুক্ত' বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বা ব্যবসায়। আর যতই দিন যাবে হয়তো পূর্বোল্লিখিত 'ইনডেনটিং' ব্যবসায় বা 'রিয়াল এস্টেট' ব্যবসায়ের মতো এ ব্যবসায়ও ততদিনই বিস্তার লাভ করবে, যতদিন না এ ব্যাপারে কোন সরকারি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন বা নীতিমালা প্রণীত ও ঘোষিত হয়। সর্বশেষে বলতে হয় যে, আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোভী মানুষের খপ্পরে পড়েছে এখন শিক্ষা অঙ্গনের মতো পবিত্র অঙ্গন। সুতরাং এ অঙ্গন থেকে যে প্রত্যাশিতমানের সুশিক্ষা সম্প্রসারিত হবে, তার কোন আশাই নেই। শিক্ষার অপ্রতুল ব্যবস্থাকে মূলধন করে যারা এ ব্যবসায়ে নেমেছে তাদের লাভ হচ্ছে বিস্তর, কিন্তু যারা এ ব্যবসায়ে পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই জ্ঞানলিপ্সু ছাত্রছাত্রীদের কি আদৌ কোন লাভ হবে?

অবিলম্বে আমাদেরকে আজকের প্রেক্ষাপটে এই জ্বলন্ত প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করতে হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সৈয়দ আসাদুজ্জামান : *সাংবাদিক কলাম লেখক*